ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1340-1345
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.354

ভ্রমণে সংস্কৃতি: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ'

বর্ণালী দত্ত, *গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Traveling is the act of moving from one place to another for the purposes like education, exploration, work, relaxation or enjoyment. Humans have always been interested in knowing the unknown. Traveling is a part of our life because it helps us to reduces daily life stress and refreshes the mind. But also, it's a process to gather khowledge about different traditions and cultures. Culture is the things that focus on the people and their daily life. Travel and culture are related to each other. Travel builds connections between people in different places. If you turn the pages of history, you will see that people have been traveling since very long time to conquer countries, establish relations, expand trade, acquire knowledge When people travel to different places, they experience the lifestyle, food habits, rituals, language of other communities. Through travel we can learn about various unknown cultures of different places that are completely unknown to us. Suniti Kumar Chattopadhyay is world famous as a linguist. In his youth, he went to England on a scholarship to study linguistics, end wrote his first travel experiences in 'patha chalti' (1st volume). 'Rabindra-sangame dipomay bharat o shyam-desh' was published in 1927. Then travelogue 'Europe' was published in 2 volumes. In this essay I am describing the various form of culture besed on the travelogue 'Rabindra-sangame dipomay bharat o shyam-desh' written by Sunitikumar Chattopadhyay. This travelogue is the testament to the experiences of traveling to places such as java, bali, shyam desh, Sumatra etc.

Keywords: Travel, Culture, Food, Clothing, Customs, Dance, Drama

অজানার আহ্বানে বেরিয়ে পড়ার আকুলতা মানুষের অন্তরে চিরকাল বিদ্যমান। ভ্রমণ হল নিজের কর্মস্থান বা বাসস্থান থেকে স্থানচ্যুতি; অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করে অন্য কোনো স্থানে যাত্রা। কারো কাছে ভ্রমণ দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে মুক্তির আস্বাদ; কারো কাছে তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদি সংগ্রহের ভাবগম্ভীর ক্রিয়াযজ্ঞ। আবার কারো কাছে ভ্রমণ অজানা রহস্যের অনুসন্ধান। প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ভান্ডারের আকর্ষণে, নতুন নতুন দেশের নতুন নতুন মানুষ তাদের সমাজ, কৃষ্টিকলা, সংস্কৃতি, তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ প্রত্যক্ষ করার তীব্র আকর্ষণে মানুষ ভ্রমণ করে। অজানাকে জানা অচেনাকে চেনার আকাঙ্ক্ষাই হল ভ্রমণ। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'চেনাশোনা' ভ্রমণকাহিনিতে ভ্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

> "এত কাল যার সঙ্গে ঘর করছি, এক একদিন তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি- কতটুকু এর চিনি! তেমনি স্বদেশের। স্বদেশকে আর একটু চিনতে চাই বলে বেড়াতে যাই। বেড়ানো বলতে বুঝি চেনাশোনা।"[১]

আসলেই ভ্রমণ হল অজ্ঞাত বিষয়কে জানা, অচেনাকে চেনা। ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যাবে মানুষ সেই স্মরণাতীত কাল থেকে দেশ জয়ের জন্য, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বাণিজ্যের প্রসার, জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রভৃতি নানা কারণে ভ্রমণ করে চলেছে। ভ্রমণসাহিত্য আসলে কোনো গাইডবুক নয় যা মানুষকে যাত্রাপথ প্রদর্শন করে। ভ্রমণসাহিত্য হল পঞ্চইন্দ্রিয়ের সচেতন অনুভূতির ফল।

বিশ্ব কবি বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 'ভাষাচার্য' নামে অভিহিত করেন। তবে শুধু ভাষাবিদ্ বললে তাঁর প্রতিভার কিয়দংশের পরিচয় দেওয়া হবে। ভাষা, উপভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ইত্যাদি নানা শাখায় তাঁর পদচারণা ছিল অবলীলায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তিনি কেল্ট, ইতালিক, জার্মানিক, বাল্তিক, ভোট, মঙ্গোল, বর্মি, কোল, ভীলন কিরাত ইত্যাদি বহু বিচিত্র জন জাতির মানুষ ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এমনকি প্রাচীন ও মধ্য ইংরেজি, জারমানিক ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব নিয়েও পড়াশোনা করেন। তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ 'The Origin and Development of the Bengali Language'. ১৯২৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ সঙ্গী হয়ে পাড়ি দেন সুদুর সুমাত্রা, মালয়, জাভা, বলিদ্বীপ। এই ভ্রমণকাহিনি সাতটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। পরে শ্যামদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত একত্রে যুক্ত হয়ে 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালের ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনি 'ইউরোপ' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশ পায় ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-এ। যৌবনে ভাষাতত্ত্ব অধ্যায়নের জন্য বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ড যান ১৯১৯-১৯২১। সেই সময়ের ভ্রমণের স্মৃতি 'লন্ডনে আমাদের দুর্গোৎসব', 'লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ : ১৯২০-১৯২১', 'ভ্রমণ প্রসঙ্গ', 'আমার নিগ্রো বন্ধুরা'- শিরোনামে 'পথ চলতি' (প্রথম খন্ড ১৯২৬)-তে স্থান পায়। তাঁর সমগ্র জীবনের বিপুল সাহিত্যকর্মে ইংরেজি ভাষায় পুস্তক ৩০টি, সম্পাদনা ৩টি, প্রবন্ধ ২০৯টি, পুস্তক সমালোচনা ১৩০টি। বাংলা ভাষায় পুস্তক ১১টি, ব্যাকরণ ৫টি, সম্পাদিত গ্রন্থ ৭টি, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ ১৬১টি, পুস্তক সমালোচনা ২৭টি। হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ ৭টি, নিবন্ধ ৪২টি, ভূমিকা ও মুখবন্ধ ১১টি। ১৯২৭ সালের আগস্ট-অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সস্নেহ ও সানুগ্রহ আহ্বানে তাঁর সঙ্গএ মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করেন। সেই ভ্রমণকাহিনি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়। পরে ১৯৪০ সালে 'দ্বীপময় ভারত' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে আর পরিবর্ধিত আকারে 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' ভ্রমণবৃত্তান্তটি প্রকাশিত হয়।

ভ্রমণ এবং সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কোনো গোষ্ঠী বা সমাজের নিজস্ব ঐতিহ্যকে সংজ্ঞায়িত করে সংস্কৃতি। এক কথায়, একটি সমাজের মানুষের সম্মিলিত জীবনচর্চা হল সংস্কৃতি। ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের মানুষের সংস্পর্শ লাভ সম্ভব ফলে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক, আমোদ প্রমোদ, বিনোদন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক নানা উপাদানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' ভ্রমণ বৃত্তান্তটি মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সেই সকল স্থানের শিল্প-সংস্কৃতির এক অনন্য দলিল স্বরূপ।

খাদ্য: রেল ও জাহাজ পথে মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণের সূত্রে বিভিন্ন জন-জাতীর মানুষ ও তাদের খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যে পরিচয়লাভ ঘটেছে তার বিক্ষিপ্ত চিত্র আমরা এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পেয়েছি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর যাত্রা শুরুতে মাদ্রাজ যাওয়ার পথে ভোরের স্টেশনের একটি দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন। ভোরে স্টেশনে চা, কফি, গরম গরম ডালের বড়া, পিঠে, নানা ধরনের তরকারি বিক্রি হচ্ছে। এই দৃশ্য খুব সাধারণ হলেও মূল উল্লেখযোগ্য বিষয় হল খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত পাত্রের ব্যবহার। তামিল ব্রাহ্মণ হোটেল ওয়ালারা সকলে অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের পাত্রে খাদ্য প্রস্তুত করছে এবং সকল তামিল তেলেগু যাত্রীরাও অ্যালুমিনিয়াম বা পিতলের পাত্র হাতেই খাওয়ারের স্টলগুলোতে ভিড় জমিয়েছে। মাদ্রাজের তামিল ব্রাহ্মণদের খাদ্য বিষয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির টুকরো তথ্যও প্রাবন্ধিক এই অংশে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন এরা কোন বিদেশিদের কাছে চা-কফি বা অন্য কোন খাদ্য বিক্রয় করে না। তামিলে ডালের ধারণাও আমাদের থেকে কিছুটা ভিন্ন। তাদের কাছে ডাল হল টক-ঝাল দেওয়া নানা মশলা মিশ্রিত মুখরোচক একটি উপাদান যা সাম্বার নামে পরিচিত এবং নানা অনুষ্ঠানে মিষ্টি স্বরূপ আবশ্যক পদ হল মিষ্টি দালপুরী, ও বেসন বুদিয়ার লাড্ডু।

বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে জাহাজে যাত্রা কালে ফরাসি ও অনামী (উত্তরে টঙকিঙ-এর লোক এবং দক্ষিণে কোচিন-চীনের লোক)-দের বিপরীতমুখী খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ পাই যা বহুমুখী খাদ্য সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে উপস্থাপন করে। সকালে সাতটায় ফরাসীরা একবাটি কফি ও সঙ্গে রুটি খায়। ওপর দিকে অনামীরা খায় চিনি ও দুধ ছাড়া সবুজ চা এবং সঙ্গে দুটো ঠোটে কলা। দুপুরে ফরাসীরা খায় সুপ, মাংস সঙ্গে রুটি এবং অত্যাবশ্যক লাল মদ। অনামীদের খাদ্য তালিকায় থাকে ভাত মাংস, তরকারী ও সবুজ চা।

চীনাদের খাদ্য বিষয়ে যে বহু বৈচিত্র্য আছে তারও উদাহরণ আমরা এই ভ্রমণবৃত্তান্তে পাই। বাবা চীনা অর্থাৎ straits-born Chinese (জন্মসূত্রে যারা মালয় দেশের অধিবাসি)-দের মধ্যে খাদ্যরীতির পরিবর্তন ঘটেছে। এরা মালাইদের মতই কাচালঙ্কা বাটা ও নারকেলের দুধ দিয়ে শুঁটকী মাছ খায়। কিন্তু আহেলি চীনারা এত লঙ্কার ঝাল বা মশলা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে না। চীনা সংস্কৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পূজার ভোগ তাদের কাছে ভোজের খাদ্য। মাছ, ডিম, হাঁস সিদ্ধ, নানা ধরনের তরকারী, সুপক্ক বরাহ সবই খাদ্য রূপে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে চীনাদের আহারের রীতিও ভিন্ন। চীনা খাওয়ায় ভাতের বাটি যার যার নিজস্ব হয়ে থাকে। বাঁ হাতে ভাতের বাটি মুখের কাছে নিয়ে chop-stick-এর সাহায্যে ভাত ঠেলে মুখে পুরে দেয়। সামনে কিছু বড়ো বাটিতে তরকারী রাখা থাকে (এই বাটিগুলি তাদের যৌথ সম্পত্তি) সেখান থেকে chop-stick-এর সাহায্য তরকারি তুলে খায়।

দ্বীপময় ভারতের বিখ্যাত আহার রীতি 'রাইস্ট্-টাফল' বা 'ভাতের হাজরী'-র বিষয়েও আমরা জানতে পারি। 'রাইস্ট্-টাফল' বা 'ভাতের হাজরী' হল যবদ্বীপীয় রীতিতে প্রস্তুত 'পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন ভাত' ইউরোপীয় রীতিতে পরিবেশন। এটি হল যবদ্বীপীয় ভোজনের ডচ্ সংস্করণ। এই খাদ্যরীতিতে তরকারীর মধ্যে মাছের উপকরণই বেশি থাকে। এমনকি মাছের পাপর, মাছের চাটনি ইত্যাদিও এই আহারপর্বের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ডচ্ খাদ্যের একটি অন্যতম উপাদান যা বর্তমানে বাঙালিদের মধ্যেও ভীষণভাবে প্রচলিত সেটি হল pankookje ইংরেজিতে pancake.

পোশাক: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজদেশের মহিলাদের পরিচ্ছদ বিষয়ে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে বলেছেন-

> "যদি কোনও পরিচ্ছদ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থের অন্যতম ব'লে, জ্ঞানতঃ পুরুষের চিত্তের বিশুদ্ধিতে কোনও রকম বিকার না এনে, যথোপযুক্ত সন্মান বজায় রেখে নারী দেহের সৌষ্ঠবকে দেখাতে পেরে থাকে, তা আমাদের ভারতীয় সাড়ী-"[২]

দ্বীপময় ভারত ভ্রমণের সূত্রে তিনি বহু দেশের মানুষের ঐতিহ্যগত পোশাকের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বলিদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন বাংলার পোশাকের কিছুটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য

করা যায়। ধোত্র, উষ্ণীষ, উত্তরীয়- এই তিনটি কাপড় মিলে তাদের পরিধেয় সম্পূর্ণ হয়। একটি ছোট ভীতর বস্ত্র যার নাম ধোত্র। উষ্ণীষ হল কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দুই-আড়াই ফের কাপড় যা সরু কটি বন্ধ দিয়ে বাঁধা থাকে, এই কটি বন্ধের নাম হল 'কাইন' কাপড়। তৃতীয় বস্ত্র খণ্ড হল উত্তরীয় যা নেটের বা জালের হয়ে থাকে। এটি বলির নারীরা প্রায়ই কোমরে জড়িয়ে রাখে। পরিচিত-অপরিচিত সকলের সামনে এইরকম নিরাবরণ বক্ষে চলাফেরা করাইও এই দেশের রীতি। কিন্তু দেব-মন্দিরে প্রবেশের সময় উত্তরীয় আবেষ্টনের দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত করা অত্যাবশক রীতি রূপে প্রচলিত ছিল। বলির পুরুষের পোশাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ছোবা বা তলওয়ার যাকে 'ক্রিস্' বলে। হাতলে সোনার রাক্ষসমূর্তি যুক্ত এই তলওয়ার এরা পিঠে বাঁধত। সামনে বা পাশে ঝুলানোর রীতি ছিল না।

মালাই নারীদের জাতীয় পোশাক হল 'সারঙ্'। এটি সেলাইবিহীন উজ্জ্বল রঙের রেশমি কাপড় যা লুঙ্গির মতো কোমরের বেঁধে পরতে হয়। তামিলদেশের হিন্দুরা লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরে এবং মুসলিমরা লুঙ্গি পরে। চীন দেশের নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রাচীন পোশাক ছিল জোব্বা। জোব্বা হল শরীরের উপরিভাগ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঢিলেঢালা একধরণের পোশাক। জাপানিদের জাতীয় পোশাক 'কিমোনো'-র ধারণাটিও এই জোব্বার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরব দেশের ঐতিহ্যগত পোশাক হল পুরুষদের ক্ষেত্রে কালো কাপড়ের লম্বা আবা, ভিতরে সাদা চাপকান, কাঁধ ও ঘাড় ঢাকা বড়ো রুমাল এবং পাগড়ী। নারীরা পরিধান করে কালো লম্বা 'সওব্' বা বহির্বাস এবং মুখ ঢাকার 'বুরক্'। আবার একই ধরনের কর্মে নিযুক্ত হলেও দুটি ভিন্ন জাতির মানুষের পোশাকও যে ভিন্ন হয় তার সুক্ষ বিশ্লেষণও এই ভ্রমণ প্রবন্ধে পাই। তিনি খুব নিখুঁত ভাবে আনামী সেপাই এবং ফরাসী সেপাইদের পরিহিত পোশাকে ভিন্ন রকম টুপির কথা উল্লেখ করেছেন। আনামীদের টুপি গান্ধী টুপির মতো ছোট উর্দীব কাপড়ের তৈরি খাকী টুপি। আর ফরাসীদের মাথায় বড়ো সোলার 'টোপা'। পরিচ্ছদের এই সুক্ষ বিশ্লেষণ জাতীর সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশিত করে।

রীতিনীতি:

শবদাহ রীতি ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান:

বলি বা বালিদ্বীপের ভাষায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে বলা হয় 'মেমুরুর'। এদের দাহ রীতি ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান রীতিটি বেশ আকর্ষণপূর্ণ। পরিবারে সদস্য কেউ মারা গেলে তারা কাঠের শবাধারে মৃতদেহকে নানা ওষুধ মেখে কাপড় জড়িয়ে রক্ষিত করা হয়। বছরে দুইবার দাহকার্যের উপযোগী ভালো সময় আসে। সেই নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে শবাধারকে কেন্দ্র করে পূজা, নৈবেদ্য প্রদান, শ্রাদ্ধ ভোজ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গরীব বা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল মানুষ অবশ্য শবদেহ সংরক্ষণের জন্য অত অর্থ ব্যয় করতে পারে না তারা মৃতদেহকে মৃত্যুর পর ভূ-প্রথিত করে দেয়। পরে শুভ দিনে মাটি খুঁড়ে দেহাবশেষ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে এবং মৃতের তালপাতার প্রতীক মূর্তি তৈরি করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করে। একই দিনে একাধিক অগ্নিকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য অর্পণের রীতিও আছে, এই সকল খাদ্য মানুষ উপহারণস্বরূপ নিবেদন করে থাকে।

উবুদ অঞ্চলে এই দাহ অনুষ্ঠানটির রীতিটিও বেশ চমকপ্রদ। দাহের পূর্বে সাতদিন ধরে নানা উৎসব হয়। তাদের রীতি অনুসারে মৃতদেহ বাড়ির দরজা দিয়ে বের করা যাবে না। সেই জন্য প্রাচীরের উপর দিয়ে উচু করে বাঁশের মাচা তৈরী করা হয়। সেই মাচা দিয়ে শবাধার দেওয়ালে অপর পারে যায়। উল্টো পাশে শবাধার বহনের জন্য থাকে বিশাল মানুষের কাঁধে বওয়া মঞ্চ যা 'ওয়াদাঃ' (wadah) নামে পরিচিত। শবদেহকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রা হয়। নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। সব চেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল যাত্রাভিনয়। রাক্ষস

ও দেবতার লড়াই অভিনয়ের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। মৃতের আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যেতে ভূত-প্রেত-রাক্ষস আসে, দেবতাদের সঙ্গে লড়াইতে তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই হল মূল অভিনীত বিষয়। আবার জাতি অনুসারে কিছু প্রতীক চিহ্ন যেমন- মাছের মূর্তি, সিংহের মূর্তি, গোরুর মূর্তি ইত্যাদি দাহ-কার্যে ব্যবহার করে থাকে।

বিবাহ রীতি:

দক্ষিণে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালায়ালীদের মধ্যে নারীদের কোনো অবরোধ প্রথা নেই। নারীরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না। তাই বিয়েতে কনের সাজেও মাথায় ঘোমটার ব্যবহার হয় না। বরের পরনে দক্ষিণের চিরপ্রচলিত পোশাক লুঙ্গির মতো করে সাদা জরীপাড় ধুতি ও গায়ে শার্ট। উড়ে কামান মাথা। আস্ত পান ও জাফরান দেওয়া কাটা সুপারি দিয়ে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। দক্ষিণের বিবাহের সবচেয়ে সুন্দর রীতি হল দোলা পিঁড়ি প্রচলন। বর-কনেকে পাশাপাশি দোলায় বসিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই মালাবদলও সম্পন্ন করা হয়। মাদ্রাজের প্রতিটি ভদ্র ঘরেই এই দোলা পিঁড়ির ব্যবস্থা থাকে। বিয়ের জন্য দেখা-সাক্ষাৎ পর্বেও এই দোলা-পিঁড়ি টাঙ্গানো হয়।

মালয় দেশের কোয়ালালম্পুর ভ্রমণকালে পেরার রাজবাড়ির বিয়ের রীতির উল্লেখ আমরা পাই। মালাই রাজকুমার ও পেরার রাজকুমারীর বিয়ে। মালয় বিয়ের উল্লেখযোগ্য রীতি হল বর-কনেকে দামি গদির বিছানায় বসানো হয়। এই বিছানার গদির দুই পাশে রূপার কাজ করা চাকতি মতন থাকে। রাজা বা বড়োলোকদের বাড়িতে এই বর-কনের গদি বা বিছানা রাখার জন্য আলাদা ঘর থাকে। তাদের বিশ্বাস এই গতি হল পবিত্র গদি। বিয়ের বর-কনে ছাড়া অন্য কেউ কখনো এই গদিতে বসেনা। এই গদিকে যবদ্বীপে 'দেবী শ্রী গদি' বলে।

উবুদের বিয়ের রীতি অতি সরল। এই দেশে বর-কনে নিজেরাই পরস্পরকে নির্বাচন করে। বাবা মায়ের অমত থাকলে ছেলে-মেয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে একত্রে বসবাস করে, তাতেই বিবাহিত বলে গণ্য হয়।

নৃত্য-গীতি ও নাটক:

বিভিন্ন স্থানে মানুষের ভাষা-পোশাক-রীতিনীতির মতো নিজস্ব নাচ-গানেরও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থাকে। কোয়ালালম্পুরের মালাইদের নিজস্ব নাচ হল 'রোঙ্গেঙ্' (Ronggeng)। 'রোঙ্গেঙ্' শব্দের অর্থ হল 'নাচওয়ালী'। সুনীতিকুমারের মতে-

> "সমগ্র মালাই-জাতির মধ্যে তাদের সৌন্দরয-বোধের আর সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রধান প্রকাশ হ'য়েছে তাদের নাচে। গান-কথা বা সুর- এদের হয় তো নগণ্য, কিন্তু নাচ এদের আশ্চর্য-রূপে ভাব-প্রকাশক।"[৩]

এই নাচ মূলত মালাই পল্লী জীবনের ছেলে ও মেয়েদের প্রাণময় স্ফূর্তি ও বিবাহ উদ্দেশ্যে তাদের প্রণয় রীতির একটি মনোহর কলা-সৌন্দর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি।

মালাইদের গানও তাদের ভিন্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক। তাদের গানের নাম হল 'পান্তুম' (pantum)। এই গানের বিষয় মূলত প্রেম। চার লাইনের ছোট ছোট সম্পূর্ণ কবিতাই হল পান্তুম গান। এই মালাই গীতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ফরাসী কবিতাও রচনা হয়েছে।

যবদ্বীপে নৃত্যের একটি ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাদের বেশিরভাগ নৃত্যকলায় যুদ্ধের একটি সুকুমার প্রকটন প্রদর্শিত হয়। নাচের গতি এবং হাতের প্রতিটি ভঙ্গী প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত কর-মূদ্রা। নাচ বা নৃত্যাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী সকলেই মূলত পুরুষ। যবদ্বীপের নাচের তালিকা-

১) wireng pandji henem (orde dans)- প্রাচীন যবদ্বীপের ইতিহাস বর্ণিত আখ্যায়িকার নৃত্যাভিনয়।

২) wireng reden hindradjit kalijan wanara hanoman- রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে যুদ্ধাভিনয়।

৩) bekaan golek- নারীদের নৃত্য।

৪) wireng raden werkocdoro kalijan praboc partipejo- রাজপুত্র বৃকোদর ও রাজা প্রতীপেয়ের যুদ্ধ।

৫) wireng panab hocdoro- তীরধনুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়।

৬) petilan langendrijo- menak djinggo den damar woelan- প্রাচীন যবদ্বীপের কোন ঘটনা বিশেষের নৃত্যাভিনয়।

যবদ্বীপের নান্দনিক সংস্কৃতির আরো একটি নিদর্শন হল 'ওআইয়াঙ্ কুলিং' বা পুতুলের ছায়া নাটক। নাটকের পাত্র-পাত্রিদের চামড়ায় কাটা মূর্তি বা ছবির ছায়া আলোর সাহায্যে সাদা পর্দার উপর ফেলে এই নাটকের প্রদর্শন করা হয়। এই মূর্তিগুলি দুটি নির্দিষ্ট রকমের হয়- একটি দেব প্রকৃতির ও অন্যটি অসুর প্রকৃতির। দেব প্রকৃতির পাত্রের নাক সরল ভাবেই আঁকা হয়, কিন্তু অসুর প্রকৃতির পাত্রের নাক হয় উঁচু। মূর্তির ঘাড়ের আকৃতিও নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। উঁচু ঘাড় বীরত্ব ভাবের প্রকাশক, বাঁকানো ঘাড় বৈরাগ্য ভাবের পরিচায়ক। আবার পুতুলের গায়ের রংও নানা তাৎপর্য বহন করে। ওআইয়াঙ্ মূর্তি দেবতা আর ঋষির হলে পায়ে জুতা আঁকা আবশ্যক।

ভ্রমণই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা বিশ্বের যে কোন স্থানের মানুষের সংস্পর্শ লাভ এবং তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও সংস্কৃতির বাস্তব ধারণা লাভ করা সম্ভব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ' এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটিতে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ ইত্যাদি স্থানগুলির মানুষের সংস্কৃতির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা আমাদের কাছে সেই সময়কালের সমাজ-সংস্কৃতির প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ। এই সকল স্থানগুলির নাচ-গান-নাটক, তাদের পোশাক, খাদ্য, নানান রীতিনীতি, বিশ্বাস সকল বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা তিনি দিয়েছেন। ১৯২৭ সালের ভ্রমণ কথা, সেই সময়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজ-রাজনীতি, সংস্কৃতি, মানুষের আচার আচরণ, চিন্তা-ভাবনায় সব বিষয়ে এখন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাই এই সকল গ্রন্থের মূল্য সাহিত্য সম্ভারে অমূল্য।

তথ্যসূত্র:

১) দাশগুপ্ত, ধীমান(সম্পা.)। অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)। বাণীশিল্প, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ.৩।

২) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ। প্রকাশ ভবন, ১৯৬৪, কলকাতা, পৃ. ৫১।

৩) তদেব, পৃ. ১৮৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বনানী। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর। রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৩।
২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে মুক্তচিন্তা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, ২০১১।
৩. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল। সংস্কৃতি পাঠ। আপন পাঠ: কলকাতা,২০২১।
৪. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩।
৫. সেন, ক্ষিতিমোহন। ভারতের সংস্কৃতি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৪।
৬. হালদার, গোপাল। সংস্কৃতির রূপান্তর। পুথিঘর, কলকাতা, ১৯৪৯।

আকর গ্রন্থ:

১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৬৪।